ইয়াকূব (আ)–এর চারিত্রিক গুণাবলী

নবী-রাসূলগণ হইলেন মানবজাতির মধ্যে আদর্শ মানব। সরাসরি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের জীবন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। সততা, নিষ্ঠা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৈর্য, সৎকর্মশীলতা, তাওয়াক্কুল সার্বিক দিক হইতে তাঁহারা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শ। নবী হিসাবে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বাইবেল যেখানে নবী-রাসূলগণের মহত গুণাবলীর যৎসামান্য বর্ণনা করার পাশাপাশি তাঁহাদের উপর এমন কালিমা লেপন করিয়াছে যে, তাঁহাদের মহৎ গুণাবলী ম্লান হইয়া গিহয়াছে, কুরআন মজীদ সেখানে তাঁহাদের মহৎ গুণাবলী তুলিয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি আরোপিত অপবাদসমূহ জোরালোভাবে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কুরআন মজীদ হযরত ইসহাক (আ) ও ইয়াকূব (আ)-সহ বেশ কয়েকজন নবীর উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছে: “ইহাদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছি” (৬ : ৮৪), “ইহাদের প্রত্যেকেই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত” (৬ : ৮৫), “ইহাদের প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি” (৬ : ৮৬)।

“আমি তাহাদেরকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম” (৬ : ৮৭)।

“আমি তাহাদেরকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করিয়াছি” (৬৪ ৮৯)।

“ইহাদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং তুমি (মুহাম্মাদ) তাহাদের পথের অনুসরণ কর” (৬ ও ৯০)।

ইয়াকূব (আ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দেন : “এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম” (১২ : ৬৮)।

তাঁহার ধৈর্য সম্পর্কে দুই স্থানে বলা হইয়াছে : ১৪ ‘পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় (১২৪ ১৮ ও ৮৩)।

অর্থাৎ প্রাণপ্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ সংবাদ শ্রবণ করিয়া এবং মিসর সম্রাটের হাতে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীন চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ শুনিয়া হযরত ইয়াকূব (আ) এই কথা বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো বলেন :

“তোমরা যাহা বলিতেছ সেই বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল” (১২ : ১৮)। আল্লাহর কাছেই তিনি সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

মহানবী (স) ইহাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন?

“তোমার সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হইলে আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা কর” (তিরমিযী, বাংলা অনু, ৪খ, পৃ. ৩১৩, বাব ৫৯, নং ২৪৫৬, কিয়ামত অধ্যায়)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনুরোধে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বিনয়ামীনকে ইয়াকূব-পুত্রগণ তাহাদের সঙ্গে মিসরে লইয়া যাইতে চাহিলে তাহাদের পক্ষ হইতে পিতাকে বিনয়ামীনের পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (১২ ও ৬৩)। তখন তিনি নবীসুলভ কণ্ঠে বলিয়া উঠেন ও

“আল্লাহ-ই সর্বোত্তম নিরাপত্তাবিধায়ক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু” (১২ : ৬৪)।

পুত্রের নিরাপত্তার জন্য পার্থিব নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য পুত্রগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের এবং তাহাদের মিসরে প্রবেশের প্রয়োজনীয় পরার্মশ প্রদানের (১২ ৬৬-৭) পর আল্লাহর মহা ক্ষমতার ও ভরসাস্থল হওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন :

“আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে অক্ষম। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁহারই উপর ভরসা করি এবং যাহারা ভরসা করিতে চাহে তাহারা যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে” (১২ : ৬৭)।

ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ হওয়ার দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনায় হযরত ইয়াকূব (আ)-এর হৃদয় ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাঁহার জন্য সৃষ্টিগত স্বভাবসুলভ শোকে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইয়াছিল (১২৪ ৮৪)।

তাঁহার দশ পুত্র এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, ইউসুফের জন্য এইভাবে সদাসর্বদা মনস্তাপ করিতে থাকিলে হয় আপনার স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে অথবা আপনি মারা যাইবেন। ইয়াকূব (আ) উত্তরে বলেন :

"সে বলিল, আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ কেবল আল্লাহর নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হইতে জ্ঞাত আছি যাহা তোমরা জ্ঞাত নও" (১২ ৮৬)।

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর এইরূপ অসহনীয় অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে জানাইয়া দিলেন যে, ইউসুফ (আ) জীবিত আছেন এবং মহাসম্মানে ও প্রতিপত্তির সহিত মিসরে শাসনকার্য করিতেছেন। উক্ত আয়াতের শেষাংশে সেই জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে।

বাইবেলীয় পণ্ডিতগণের মতে পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদকাল ছিল বাইশ বৎসর (খ্রি. পূ. ১৭২৮-১৭০৬ সাল; বাইবেল ডিকশনারী, পৃ. ২৩) এবং কোনও কোনও তাফসীরকারের মতে চল্লিশ বৎসর (বিস্তারিত দ্র. ইউসুফ শীর্ষক নিবন্ধ)। দুঃখ ও মনস্তাপ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং সন্তানদেরকে আশার বাণী শুনাইলেন:

“হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর দয়া হইতে তোমরা নিরাশ হইও না। কারণ আল্লাহর দয়া হইতে কেবল কাফেররাই নিরাশ হয়” (১২ : ৮৭)।

সংবাদবাহক আসিয়া যখন ইউসুফ (আ)-এর খবর জানাইল এবং ইউসুফ (আ)-এর জামা তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে রাখিতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তখন দশ পুত্র

আসিয়া পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইল। তিনি বলিলেন :

“আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়” (১২ : ৯৮)।

নবী-রাসূলগণ হইলেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক। তাঁহারা আল্লাহর বিধানের সীমালংঘনের অপরাধ ব্যতীত ব্যক্তিগত কারণে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং অপরাধীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করেন। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনও ব্যক্তিগত কারণে কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।

“রাসূলল্লাহ (স) ব্যক্তিগত কারণে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই, তবে আল্লাহর

নিষিদ্ধ বিষয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলে শাস্তি দান করিতেন” (বুখারী, বাংলা অনু., মানাকিব, বাব ২৪, নং ৩২৯৬, ৩খ., পৃ. ৪৬৩; আদাব, বাব ৮০, নং ৫৬৮৬, ৫খ, পৃ. ৪৯৩; হুদূদ, বাব ১০, নং ৬৩১৭, ৬খ, পৃ. ১৭৬; মুসলিম, বাংলা অনু, ফাদাইল, বাব ৩৩৪, নং ৫৮৩৮, ৭খ, পৃ. ৩৩০; নং ৫৮৪২, পৃ. ৩৩১, বাব ৩৩৫; আবু দাউদ; আদাব, বাব ৪, আল-আফবু; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জামে, বাব হুসনিল খুলুক)।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষা, হিজরত, কঠিন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ ইত্যাদি কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রগণ ও পৌত্র ইয়াকূব (আ)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং অনুগ্রহ ধন্য করেন :

“এবং আমি তাহাদেরকে দান করিলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাহাদের সুনাম-সুখ্যাতি সমুচ্চ করিলাম” (১৯৪ ৫০)।

মাওলানা শাববীর আহমাদ উছমানী (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের এক বিরাট অংশ তাঁহাদের দান করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাঁহাদের স্মরণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে সকল ধর্মের অনুসারীরা তাঁহাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাদের গুণগান করে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত স্থায়ীভাবে তাহাদের নামাযে দুরূদ শরীফের মাধ্যমে তাহাদেরকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করেন। বস্তুত ইহা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই দোআ কবুল হওয়ার ফল :

“আমাকে তুমি পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর” (২৬ : ৮৪; শায়খুল হিন্দের তরজমা, উক্ত আয়াতের ২নং টীকা, পৃ. ৪১২, সৌদী সংস্করণ)।

আল্লাহ তাআলা ইয়াকূব (আ)-কে তাঁহার পিতা ও প্রপিতার সঙ্গে নানামুখী অনুগ্রহে ধন্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ, মানবজাতির নেতা, পথপ্রদর্শক ও ইবাদতপ্রিয় বান্দা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন :

“এবং আমি ইবরাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব; আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। আমি তাহাদেরকে করিয়াছিলাম নেতা। তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করিত। আমি তাহাদের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে,

নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে। তাহারা আমারই ইবাদতকারী ছিল” (২১৪ ৭২-৩)।

প্রপিতামহ, পিতামহ ও পুত্রের প্রতি আল্লাহ তাআলার আরো কতক অনুগ্রহের বর্ণনা এভাবে প্রদত্ত হইয়াছে :

“স্মরণ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তাহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাহাদেরকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, তাহা ছিল পরকালের স্মরণ। অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত” (৩৮ : ৪৫-৭)।

“শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদশী” বলার তাৎপর্য এই যে, পিতা-পুত্র-পৌত্র তিন পয়গাম্বর বড়ই সৎকর্মশীল ছিলেন। আল্লাহর আনুগত্যে

অবিচল থাকা এবং বিপদ-মুসীবতে দৃঢ়পদ থাকার বিরাট শক্তি তাঁহাদেরকে দান করা হইয়াছিল। আল্লাহর দীন প্রচারে তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর-দৃষ্টি ও বিবেক-বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাই তাঁহারা ছিলেন সত্যদর্শী। "পরকালের স্মরণ" বলিতে তাঁহারা নিজেরাও আখিরাতের জিন্দেগীর কথা স্মরণ করিতেন এবং অন্যদেরকেও স্মরণ করাইয়া দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে পার্থিব মোহ ও লোভ-লালসার নাম-গন্ধও ছিল না। তাঁহাদের সব চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা ছিল আখিরাতমুখী (তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাদ-এর ৪৮-৪৯ নং টীকা অবলম্বনে; আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, **১৫ খ., পৃ. ২১৭-১৮; তাফসীরে কবীর, ২৬ খ., পৃ. ২১৬-১৭; তাফসীরে তাবারী, ১০ম বালাম, ২৩ খ, পৃ. ১০৯-১০; তাফসীরে ইবন কাছীর (সংক্ষিপ্ত), ৩খ, পৃ. ২০৬-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার বিস্তারিত রূপ)।**